Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.01-07
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

স্ত্রীশিক্ষা: নারীমুক্তি ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-একটি পর্যালোচনা

ড.সুজিত মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, মহিষাদল, পূর্বমেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

women in India were deprived for education privileges for centuries, but there were always some expectations to this general condition.It is difficult to determine the exact extent of education imparted to women during the early Vedic period in India.Uponayana ritual was obligatory for girls,and this must have ensured the imparting of a certain amount of Vedic and literary education to the girls of all classes.But female education received a great set-back during later vedic period primarily owing to the deterioration of religious status of women.During the Medieval peroid women education was constrained because Muslim men were also subjected to low educational attainment in general. The reawakening of India was started with the efforts of Ram Mohan Roy.Afterthat Iswarchandra vidyasagar also took a leading role in that field.At the outset Christian missionary had started English education in India. Systematic female education was started in India with the efforts of Baptist Mission Society in 1819.Vidyasagar was also a fully supporter of female education by improving the condition of Indian .He took an important role to spead education among women with the help of Sir J.E.Drinkwater Bethune .He established 35 female schools with an average total attendance of 1300 girls in four districts.Besides,Vidyasagar was appointed as Honorary Secretary of Bethune School Committee for the progress of this school.Miss Mary Carpenter also helped vidyasagar to spread education among women in India. After Independence of India, government has taken various measures to provide education to women. As a result, women's litracy rate has grown over the three decades and the growth of female literacy has infact been higher than that of male literacy rate.

Keyword: Renaissance, Intellectual, Systematic, Supervision, Vedanta, Compound, Missionaries, Idealism, Moderity, Vernacular, Superstitions, Emancipation, Enegetic, Impulse, Inspector, Committee, Philanthropic, Acquaintance, Superintendent, Lieutenant.

ভুমিকা: সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই ক্রিয়াকলাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ –উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়।মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা রুপে পরিচিত সিন্ধু সভ্যতায় নারীর প্রাধান্য থাকলেও বৈদিক ও বেদোত্তর যুগ থেকে (পিতৃতান্ত্রিক সমাজে) পুরুষের প্রাধান্য স্থাপিত হলে নারী ক্রমশ অন্তঃপুরবাসী হয়ে পড়ে। বৈদিক ও বেদোত্তর যুগ থেকে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্ক, বিবাহ সম্পর্কিত রীতিনীতি, শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বিধান দিয়েছেন এবং বিভিন্ন যুগে সমকালীন সমাজে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী

বিধানগুলি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে।[1] প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতে বালিকাদের গুরুগৃহে পাঠিয়ে অনেকাংশে শিক্ষাদানের রীতি প্রচলিত না থাকলেও প্রাচীনকালে গার্গী, মৈত্রী, অপালা, লোপামুদ্রা প্রমুখ বিদুষী রমণীর কথা জানা যায়; য়ারা স্বচেষ্টায় জ্ঞানতাপস পিতা,মাতা ও স্বামীর সহযোগিতায় বাড়িতে বসে জ্ঞান অর্জন করেছেন। মধ্যযুগেও নারীদের স্বাধীনতা এবং অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে।প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতে সমাজপতিরা স্ব স্বার্থে একের পর এক বিধি নিষেধ দ্বারা নারীজাতিকে কুসংকারের জালে আবদ্ধ করেছে।[2]

ঔপনিবেশিক শাসনে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে এবং এর প্রধান ভিত্তি ছিল যুক্তি ও মানবতাবাদ-যা সমকালিন শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।নবসৃষ্ট বঙ্গ সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে নারীশিক্ষা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।[3]

ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে)প্রায় অর্ধশতাব্দী পর যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয় ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন হুগলী জেলার এবং বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর সন্তান রুপে।[4] এই সময় নব্যবঙ্গনদের প্রচেষ্টায় বাংলা তথা ভারতে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। ইউরোপ থেকে আগত আলেকজান্ডার ডাফ, মেরি কারপেনটার, বেথুন প্রমুখ সংস্কারকগণ সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে আত্মবিকশিত নারীর অসামান্য ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বাংলায় নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত হয়।এই সময় নিজস্ব গুনে উজ্জ্বল ছিলেন বাংলার অমর সন্তান ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর শিক্ষা ও কর্ম জীবনের সূচনায় বাংলার ধর্ম ও সমাজ এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্যদিয়ে চলে। হিন্দু ধর্ম খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। রামমোহন রায় যুক্তি ও মানবতাবাদের উপর হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্টা করেন ও সকল ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করে এর যোগ্য জবাব দেন। রামমোহন রায়ের প্রগতিশীল সংস্কারগুলি রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মেনে নেয়নি। খ্রিষ্টান মিশনারির পাশাপাশি ডিরোজিওর অনুগামী নব্যবঙ্গনও হিন্দুধর্মের কুপ্রথা ও কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।বিদ্যাসাগর যখন সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন তখন বাঙালি সমাজ সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল ।ব্রাহ্মসমাজ ও নববঙ্গ-উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাদের সহায়তা করলেও কাদেরও সাথে কখনো ঘনিষ্ঠ হননি। নিজের বিবেক ও বিবেচনা অনুযায়ী তিনি সর্বদা লক্ষ্য ও পথ নির্ধারণ করেন।[5]

রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারনে আন্দোলন শুরু করেন। ফলস্বরুপ স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর বাঁচার অধিকার আছে -এ ধারনায় বশবর্তী হয় নারী সমাজ যদিও এর দ্বারাই নারীর সর্বময় মুক্তি হয়নি।নারীকে কুসংকারের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল স্ত্রীশিক্ষা।বাঙালী মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে প্রথম এগিয়ে এসেছিল খ্রিষ্টান মিশনারিগুলি। লন্ডন মিশনারি সোসাইটির সদস্য রবার্ট মে উল্লেখ করেছেন যে, ১৮১৮ খ্রি. লন্ডন মিশনারি চিনসুরাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮১৯ খ্রি. ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি ভারতে নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভুমিকা নেয়। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি ১৮১৯ খ্রি. কলকাতায় প্রতিষ্টা করে "The Female Juvenile Society''; যার লক্ষ্য ছিল বাঙালি নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ১৮২৩ খ্রি.এই সোসাইটি ৮টি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করে। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ১২টি স্কুল পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। চার্চ মিশনারি সোসাইটি বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য"Ladies Society''প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৮২৪ খ্রি.মধ্যে কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ২৪ টি স্কুল পরিচালনা করে। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের চার্চ মিশনারির তত্বাবধানে কলকাতা ও শ্রীরামপুর এলাকায় ৪৪৮ জন, ঢাকায় ১৯০ জন, চিটাংগাওতে ১০০ জন এবং বীরভূমে ৯০ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করে।[6]

১৯৩০ এর দশকে ইয়ংবেংঙ্গলরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শিক্ষার সমর্থনে লেখালেখি শুরু করে।বিভিন্ন সভা-সমিতিতে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আলোচনা হয়।দেশীয় উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৪৭ খ্রি.।বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র ও সহোদর নবীনকৃষ্ণ মিত্র এই উদ্যোগ গ্রহন করায় সমাজ তাদেরকে একঘরে করে। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হয়ে কলকাতায় আসেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন।নারী কল্যানে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য কলকাতায় ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখাণা বাড়িতে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের পঠনপাঠন শুরু করেন।বেথুনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মদনমোহ্ন তকার্লঙ্কার এবং ঈশ্বরচদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের (যা পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত)অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে যোগদান দেন।[7]

উপনিবেশিক শাসনকালে বাংলায় দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সঙ্গিন। প্রায় এক লক্ষ বিদ্যালয়ের অর্ধেক ছিল গ্রামে অবস্থিত। ১৮৫৪ খ্রি.বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এফ.জে.হ্যালিডের প্রতিবেদনে দেখা যায় শিক্ষক ও পাঠ্য পুস্তকের অভাব দেশীয় শিক্ষার অবনতির কারন।ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষা ক্রমশ গুরুত্ব হারায়। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করতেন, তখন তিনি সমাজের অবক্ষয়, কুসংকার ও নারী জাতির দুর্দশার কথা উপলব্ধি করেন। তিনি জানতেন শিক্ষাই নারী মুক্তির প্রথম ধাপ।[8] বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের সাহায্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি নারী শিক্ষার বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীজাতি যেভাবে উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করত তা তিনি জানতেন। তিনি এও জানতেন যে এর হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ শিক্ষার মাধ্যমে নারী জাতিকে আধুনিক মনষ্কা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা। তাই তিনি শিক্ষার মাধ্যমে নারী জাতিকে আত্মমর্যাদায় ভূষিত ও আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান করতে চেয়েছিলেন।[9]

উপনিবেশিক শাসনকালে এদেশের রক্ষণশীল সমাজ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতি না থাকায় ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনের প্রথম দিকে কোণো প্রকার উৎসাহ দেখায় নি। ১৮৫০ খ্রি.৪ সেপ্টেম্বর কোর্ট এর নির্দেশনামায় স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হয়। ১৮৫৩ খ্রি.ব্রিটিশ সরকার নারীশিক্ষার প্রসারে আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৮৫৪ খ্রি.উডের প্রতিবেদন অনুসারে ব্রিটিশ সরকার এদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় ও দায়িত্ব গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৮৫৪ খ্রি.হ্যালিডে সাহেব বাংলার ছোট লাট হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলগুলির অবস্থা অনুসন্ধান করুক এবং এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয় এর সাথে কথাও বলেন। বিদ্যাসাগর জানতেন উচ্চবর্ণের(বর্ণ হিন্দু সমাজের) মেয়েরা সহজে প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে এসে লেখাপড়া করবে না।তাই তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত ছিলেন, কারন তৎকালীন সময়ে স্বামী এবং স্ত্রী বিশ্বাস করত স্ত্রী শিক্ষিতা হলে বিধবা হয়।বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন মুক্ত প্রচার দ্বারা এ ব্যাপারে জনমত গঠন করা যায়। তিনি অনুভব করেন সমাজকে বোঝাতে হলে ধর্ম দিয়েই বোঝানো সম্ভব। তাই তিনি শাস্ত্রকে থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে প্রচার করেন 'কন্যাকে অতি যত্নের সাথে পালন করতে হবে,শিক্ষা দিতে হবে'। [10]

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিদ্যাসাগর সহকারী স্কুলপরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং পরে দক্ষিণবঙ্গের স্কুলগুলির বিশেষ স্কুল পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং এই কাজের জন্য তিনি অতিরিক্ত ২০০ টাকা সাম্মানিক পান।এই সময় ব্রিটিশ সরকারের স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যাসাগরকেও অনুপ্রানিত করে এবং তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে নিজেকে মনোনিবেশ করেন।তিনি কলেজের দীর্ঘ ছুটির সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন স্কুল স্থাপনের জন্য এবং এ বিষয়ে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন।[11] ১৮৫৭ খ্রি.১৮ মার্চ স্কুল পরিদর্শক মি.প্রাত্ত (Pratt); ডি.পি.আই. এর নিকট একটি প্রস্তাব দেন যেটি ভারত সরকার এর নিকট প্রেরন করা হয়।এই প্রস্তাবে হুগলী জেলার দ্বারহাটা (হরিপাল থানার অন্তরগত)ও গোপাল নগর(বৈদ্যবাটি)গ্রামে এবং বর্ধমান জেলার নয়াগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব সমস্ত স্কুল গুলির ব্যয়ভারের দায়িত্ব গ্রহন করেন।[12]

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রদক্ষেপ হিসাবে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ খ্রি.এপ্রিল মাসে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ৪ থেকে ১১ বছর বয়সের ২৮ জন ছাত্রী নিয়ে এই স্কুলের যাত্রা শুরু হয়।বিদ্যাসাগর কঠোর পরিশ্রম করে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মে এর মধ্যে বাংলার ৪টি জেলায় মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।৩৫ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি এবং নদিয়া জেলায় ১টি অবস্থিত ।বিদ্যাসাগর দ্বারা স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করতে প্রতি মাসে ব্যয় হত ৮৪৫ টাকা এবং এই স্কুলগুলিতে ১৩০০ ছাত্রী পড়াশোনা করত।পরবর্তীকালে তিনি উপরোক্ত ৪টি জেলায় আরও ১৫টি অর্থাৎ মোট ৫০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ।[13]

বিদ্যাসাগর স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য সরকারি সাহায্যের আবেদন করেন। ১৮৫৮ খ্রি. সরকার বালিকা বিদ্যালয়গুলি জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে বিদ্যাসাগর শেষের ১৫টি স্কুল অতি দ্রুততার সাথে প্রতিষ্ঠা করেন এবং যে অঞ্চলের স্থানীয়রা গৃহনির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল বিদ্যাসাগর সেখানেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।তিনি মনে করতেন সরকার বিদ্যালয় গুলির ব্যয়ভার বহন করবে।সরকার ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অস্বীকার করলে শিক্ষকদের বেতন বাবদ ৩৪৩৯৫/ টাকা বাকি পরে।বিদ্যাসাগর বিষয়টি নিয়ে ডি.পি.আই.কে চিঠি লিখলে তার প্রত্যুত্তরে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরকে জানানো হয় যে বকেয়া অর্থ শোধ করা হলেও পরবর্তীকালে নিয়মিত অর্থ দেওয়া সম্ভব নয়।[14]

মহাবিদ্রোহের পর সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করলে বিদ্যাসাগর আশাহত হন। তিনি ব্যাক্তিগত ভাবে অনেকগুলি স্কুল পরিচালনার আর্থিক দ্বায়িত্ব নেন। ১৮৫৮খ্রি. বিদ্যাসাগর চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ায় আর্থিক অনটন না থাকলেও মাসিক মাহিনার নিরাপত্তা ছিল না, তথাপি তিনি স্কুলগুলিকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করতে সবরকম প্রয়াস চালিয়ে যান।তিনি বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য 'নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডার' স্থাপন করেন।সাধারন মানুষ এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করত এবং এতে তৎকালিন ছোটলাট সেসিল বিডন মাসিক ৫০ টাকা প্রদান করতেন। [15]

বেথুন স্কুলের সম্পাদক হিসাবে বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করেন স্কুলে ক্রমাগত ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে এবং মেয়েরা লেখাপড়া ও সেলাই কাজে অত্যন্ত দক্ষ হচ্ছে,তথাপি চাকা গাড়ির অভাব, বাল্যবিবাহ, ধনী,ব্যাক্তিদের অনীহা মেয়েদের পড়ার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৬৪ খ্রি.হেনরি উড্রো এক রিপোর্টে দেখিয়েছেন বেথুন স্কুলে ভদ্রলোকরা তাঁদের মেয়েদের পাঠালেও ধনী লোকরা পাঠাচ্ছে না।[16] স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মেরী কার্পেনটার ১৮৬৬ খ্রি.কলকাতায় আসেন এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে বিদ্যাসাগর সহ কিছু বিশিষট ব্যাক্তিদের নিয়ে ১৮৬৬ খ্রি.১ ডিসেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি একদল দেশীয় শিক্ষিকা তৈরির জন্য 'মহিলা নর্মাল স্কুল' খোলার প্রস্তাব গ্রহন করে।বিদ্যাসাগর জানতেন স্ত্রী নর্মাল স্কুল খোলার সময় এখনও আসেনি,তাই তিনি এক চিঠিতে মেরী কার্পেনটারকে এ বিষয়ে তারাতারি সিদ্ধান্ত না নেওয়ার অনুরোধ জানান।১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মেরী কার্পেনটার, ডি. পি. আই. এবং স্কুলের পরিদর্শককে নিয়ে বিদ্যালয়গুলির অবস্থা দেখাতে যান। আবহাওয়া খারাপ এবং প্রচুর বৃষ্টির দরুন রাস্তা খারাপ হওয়ায় ফেরার পথে বিদ্যাসাগরের গাড়ি উল্টে যায় এবং তিনি যকৃতে দারুণ আঘাত পান।

১৮৬৭ নাগাদ বেথুন স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা কমে গেলে বিদ্যাসাগর,কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী-এই তিন জনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল বেথুন স্কুলের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। এই কমিটি স্কুলের অবনতির জন্য প্রধান শিক্ষিকা মিস পিকটকে দায়ী করে।[17] ১৮৬৭ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর ছোটলাট গ্রে বিদ্যাসাগরের নিকট দুটি বিষয়ে মতামত জানতে চান- ১).ছাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ায় সরকারের খরচ বেড়ে যাচ্ছে; এক্ষেত্রে বেথুন স্কুলটি বন্ধ করা উচিত হবে কি না? এবং ২). দেশীয় শিক্ষিকাদের জন্য স্ত্রী নর্মাল স্কুল

স্থাপন করা সম্ভব কি না? বিদ্যাসাগর ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর ছোটলাটকে জানান যে বেথুন স্কুল বন্ধ করা উচিত নয় আর স্ত্রী নর্মাল স্কুল খোলার সময় তখনও অসেনি।[18]

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শিক্ষাদপ্তর বেথুন স্কুলের দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহন করলেও টেমস কার্পেনটারের পরামর্শে মহিলা বিদ্যালয় স্বতন্ত্র ভাবে পরিচালনা করে।শিক্ষাদপ্তর ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বেথুন সংলগ্ন স্ত্রী নর্মাল স্কুলটি বন্ধ করে।স্ত্রী নর্মাল স্কুল স্থাপনে বিদ্যাসাগরের নীতিগত কোন আপত্তি ছিল না এবং তিনি শুধু সামাজিক বাধার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। সরকার বেথুন স্কুলের দ্বায়িতভার গ্রহন করলেও বিদ্যাসাগর আজীবন এই স্কুলের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন।[19]

স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করলেও নিজের পরিবারের স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে নীরব ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার সুবল চন্দ্র মিত্র সহ অনেকেই সমালোচনা করেছেন।[20] উচ্চ শ্রেণির মধ্যেই শুধু স্ত্রীশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল এ কথা বলা যায় না। বাংলার মেয়েরা যদি সতী হয়ে নিজেদের দাহ করে তবে তারাই আবার পুঁথি হাতে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। শিক্ষার আলো সকলের মধ্যে সমানভাবে পড়ুক সে সময় তা অনেকেই চাইত না। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বাধা এসেছিল নানাদিক থেকে এবং বিভিন্ন ভাবে। সকল বাধা অতিক্রম করে বিদ্যাসাগর গভীর দুরদৃষ্টির মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় ১৩০ বছর অতিক্রান্ত হলেও তাঁর চিন্তা ও আদর্শ আজও নারীশিক্ষা প্রসার আন্দোলেন সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। নারী মুক্তির জন্য সর্ব প্রথম দরকার নারীশিক্ষা এবং একাজ বিদ্যাসাগর শুরু করলেও শেষ করার দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের। আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় নানা প্রকল্পের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষা সম্প্রসারনের কাজ চলছে। ষষ্ঠ যোজনায়(১৯৮০-৮৫)১০-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েদের ন্যূনতম শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ছাত্রীদের স্কুলছুট এর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। ভারতের অন্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।প্রতি যোজনা কমিশনে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটে চলেছে।স্বাধীনতার সময় ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল ১২%। ২০০১ এর জনগণনায় ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল ৭৪%; যার মধ্যে পুরুষ-৮২% এবং নারী ৬৫.৪০%। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে নারী শিক্ষার হার ছিল ২৮.২%, মাধ্যমিক স্তরে ১২.৫%,স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৫.৪%। ২০০১-২০১১ সালে ভারতে নারী সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ১১.৮%; পুরুষ সাক্ষরতা বৃদ্ধির হারের(৬.৯%) তুলনায় অধিক; যার অর্থ স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বিভেদ কমে আসছে।[21]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'বয়স্ক শিক্ষাসূচি প্রকল্প'গ্রহন করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল সকল শ্রেণীর বয়স্ক মহিলার শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপায়ী দ্বারা সর্ব শিক্ষা অভিযান প্রকল্প গ্রহন করা হয়; যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করা। সর্ব শিক্ষা অভিযানে মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ যোজনা গ্রহন করা হয় যার মধ্যে অন্যতম ছিল কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনা। ২০০৪ সালে এই যোজনাটি চালু করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা।[22]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারী শিক্ষা প্রসারে ১৯৯০ সালের ৮ মে মাসে সর্ব শিক্ষা অভিযান চালু করে এবং মেদিনীপুর জেলাকে মডেল হিসাবে গ্রহন করে। এই অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি এবং এই সময় নারীদের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের অধীনে আনা হয়।[23] যে গ্রামে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম বা নেই সেখানে শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের দ্বারা সব বয়সের মহিলাদের শিক্ষালাভের সুযোগ করেছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার প্রসার এবং অনগ্রসরশ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় আনার জন্য কন্যাশ্রী, রুপশ্রী, সবুজসাথী প্রকল্প ও বৃত্তি দানের ব্যাবস্থা করেছে।[24]

উপসংহার: পরাধীন ভারতে বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার পথ দেখিয়েছেন; যদিও তার পূর্বে কয়েকজন বিদেশী ও ভারতীয় নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সফল হয়েছেন তথাপি স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে

পারেনি।আমাদের এজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বিদ্যাসাগরের জন্য, যিনি শুধু স্কুল স্থাপনই করেন নি, তা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়াসও চালান।বিদ্যালয় পরিচালনার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা, বিক্রয় ব্যবস্থা, নর্মাল স্কুল স্থাপন, নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যাবস্থা বিদাসাগরের পক্ষেই সম্ভব ছিল ।তাঁর আগে ও পরে যারা স্ত্রী শিক্ষার সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের মতো এত দ্বায়িত্ব নেননি। বিদ্যাসাগর গৃহীত নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির প্রয়াস এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং এ পথে প্রধান বাধা নারী।তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসতে হবে দেশের বৃহত্তর অংশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে। দেশে যে সাক্ষরতা অভিযান আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরায়নি। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকার অনেকাংশে সফল। আমরা আশাবাদী যে আগামী দিনে নারীরা শিক্ষিত ও সচেতন হয়ে নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ বেছে নেবে।

সূত্র নির্দেশ:

1. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাত, ২০০১ (প্রথম প্রকাশ), পৃ.৪১-৪৪.
2. প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৬-৮৭.
3. .রাখাল চন্দ্র নাথ, উনিশ শতক ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.xi-xxviii.
4. .Aparna chatterjee, Iswar chandra Vidyasagar-A Profile of the Philanthropic Protagonist,http.//ezinear-ticles.com.
5. .Amalesh Tripathi, Vidyasagar: The Traditional Moderniser,Orient longman,Calcutta,1974,pp.-65-66.
6. .প্রাগুক্ত,পৃ.৬৬।
7. .প্রাগুক্ত,পৃ.-৬৭।
8. .Santosh Kumar Adhikary, Vidyasagar and the Regeneration of Bengal, Subarnarekha, Calcutta, 1980, p.-43.
9. .Gopal Halder,Vidyasagar-A Reassessment,People's Publishing House,New Delhi,July 1972,p.-51.
10. .Manik Mukhopadhyay &et.al.The Golden Book of Vidyasagar a commreorative Volume, calcutta, p.-364.
11. .Syamal Chakrabarti, Vidyasagar, National Council of Education Research and Training, New Delhi, 1971, p.-51.
12. .এস. কে. বসু ,ঈশর চন্দ্র বিদ্যাসাগর,ন্যাশানাল বুক টাস্ত,নতুন দিল্লী,১৯৭২,পৃ.২৭-২৮.
13. .Manik Mukhopadhay & et.al, op.cit.,p.-367.
14. .Amalesh Tripathi, op.cit.,p.71.
15. .Manik Mukhopadhay & et.al.,p.-369.
16. .Amalesh Tripathi, op.cit.,p.-72. & এস.কে.বসু, .প্রাগুক্ত,পৃ.-৩৩।
17. .Manik Mukhopadhayay & et.al., op.cit.,p.-371.
18. যোগেশ চন্দ্র বাঙ্গাল, বিদ্যাসাগর পরিচয়, রঞ্জন পুব্লিশিং হউস,কল্কাতা,১৯৬০,পৃ.৫২।
19. .Manik mukhopadhay &et.al.,op. cit.,p.-372.

20. .Subhal Chandra Mitra,Iswar Chandra Vidyasagar:A Story of his life and work,Sarat Chandra Mitra,Calcutta,1920,
21. .www.bn.w.wikipedia.org.
22. .https.bn.m.wikipedia.org.
23. .www.bbc.com.
24. .https://biplobparbatipur.blogspot.com.